ভারত সভ্যতায় আদিবাসীদের ভূমিকা - অভিপ্রস্থ ানী আদিবাসী জনগণ

শুভাশিস্ সিন্হা

মূলত পশ্চিমবঙ্গীয় আদিবাসীদের অভিপ্রস্থানের (Migration) বিষয় নিয়ে এই অংশে প্রাসঙ্গিক কিছু আলোকপাত করা হবে বিশেষত ইংরাজ আগমনের পরবর্তী অবস্থায় উদ্ভূত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে আদিব াসীরা প্রবল ভাবে ভূমিচ্যুত হয় ও বিপুল বঞ্চনার শিকার হয়। ইংরাজদের সম্পদ সংগ্রহের শিকার হয় এই সমস্ত ভূমিপুত্ররা (Sons of the Soil)।

ভারতীয় সভ্যতা কৃষি সভ্যতা। নদী মাতৃক সভ্যতা মাত্রই কৃষি সভ্যতা। ভারত সভ্যতা ভারত আদিবাসীর হাতে তৈরি সভ্যতা। কৃষকের সভ্যতা। ইতিহাস পূর্ব সময়ে উন্নত নগর সভ্যতার স্থপতি আদিবাসী জনগণ। ইতিহাসপরবর্তী যুগে তাদের তৈরী মূল সভ্যতার পৌর ও গ্রামীন কেন্দ্রগুলি পরজীবী শোষক শ্রেণীর মানুষ এবং বিদেশী ইংরাজ লুটেরার হস্তগত হয়। ফলে অরণ্য পাহাড় এর দুর্গম অঞ্চলে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে তারা নোতুন কৃষি ব্যবস্থায় আবার গ্র ামীন বসতি গুলি গড়ে তুলতে থাকে। মাতৃভূমি ছোটনাগপুর--- সাঁওতাল পরগণা, মেদিনীপুর, পুলিয়া ও বাঁকুড়ায় ত ারা উদ্যম, শক্তি ও মনের আনন্দে সোনা ফলাতে শু করে। অর্থের প্রতি অপ্রলুব্ধ ভূমিপুত্ররা সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন চর্যায় বিশ্বাসী। গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনের বাইরে মা মাটীকে নিঙড়ে নিঃশেষ করার অবিচারে তারা মত্ত ছিল না। মোঘল যুগে তারা এই অঞ্চলে স্বাধীন স্বরাজনৈতিক জীবন ও জীবিকার অঙ্গীভূত হয়ে বাস করছিল। ছোটনাগপুরের ম াটীর তলারকার খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, ফসলের উদ্ধত গ্রীবা ইংরাজকে প্রলুব্ধ করেছিল। দেশীয় জমিদার, মহ াজন ও বানিয়াদের শোষণের মাত্রা অভাবিত ভাবে চড়িয়ে দিয়ে তারা আদিবাসীদের স্ব নির্ভর স্বচ্ছন্দ জীবন ও জীবিক ার ভিত্তিভূমিটাই বিনষ্ট করল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনী রূপ সাঁড়াশীর মতো কৃষিজীবী, নির্বিরোধী, সহজ সরল ম ানুষগুলির গলা চিপে ধরল। আমাদের এখনকার অনেক ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক আদিবাসীদের অসভ্য, বর্বর, আদিম বলে মনে করেন, সাধারণ মানুষের কথা বাদই দিলাম। বস্তুত এই সহজ সরল প্রকৃতির সন্তানেরা বিপুলসংখ্যক নিরক্ষর ছিল কিন্তু অশিক্ষিত ছিল না। শিক্ষা ও বিবেচনার স্তর গুলি অনেক বেশী ভূমিজচেতনা থেকে উঠে আসা বলে, ইংরাজের তথাকথিত শিক্ষায় দীক্ষিত মানুষের ছল চাতুরী শঠতার নামান্তর বলে মনে করেন। এগুলি অবেগজনিত কথা নয়। আদিবাসীদের সঙ্গে জীবনে যারা কখনও মেলামেশাকরেননি তারাই বরং এ ব্যাপারে অজ্ঞ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আদিবাসী জনতার অভিপ্রস্থানিক বিষয়টী অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ। অভিপ্রস্থানের একটী সুগভীর সামাজিক প্রভাব রয়েছে। বার বার শাসক শোষক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত সভ্য মানুষের বঞ্চনার শিকার হয়ে আদি কাল থেকেস্থান থেকে স্থানে ঘুরে বেড়ানোর ফলে, এক জায়গায় থিতু হয়ে যুগ যুগান্ত ধরে নিজেদের বৈশিষ্ট্যমূলক সংস্কৃতি চর্চা করার সুযোগ না প াওয়ার ফলে, যাযাবর জীবনের গণ্ডী পেতে ঐতিহাসিক গুত্বপূর্ণ সময় গুলিতে তারা অনেকক্ষেত্রেই অসফল হয়েছে। জুম চাষ থেকে ধান সিঁড়ি চাষ পদ্ধতি (Terrace Cultivation) রপ্ত করেতে পারে নি। যেখানে তারা বাঘ ভালুক তা ড়িয়ে, বনজঙ্গল হাসিল করে উন্নত কৃষি পদ্ধতিরপত্তন করেছে সেখনেই শোষকের দল গিয়ে হাজির হয়েছে। তাদের প াকা ধানে মই আর বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে। তাদের সর্বস্বান্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। এছাড়াও তাদের সামা

জিক ঋিাস ও অভ্যাসগুলির চর্চা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান মৌলবাদীদের প্রভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। এই বিপর্যয় তাদের ভাষা লিপি, ধর্ম, পূজা পার্বন উৎসব ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার সমস্ত পথ অবরোধ করেছে। নানা জায়গাতে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হওয়ার ফলে একই আদিবাসী জাতির ভাষাগত, ধর্মগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য ব্যাপক সঙ্কটময় অবস্থার সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ হিশেবে বলা যায়, ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা পশ্চিমবঙ্গ, অসম, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরার সাঁওতালদের থেকে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। ইংরাজের চাতুর্যে চা বাগানে চলে যাওয়া চা-বাগিচার আদিবাসী কৃষিশ্রমিক অন্যান্য প্রান্তিক কৃষি ও ক্ষেত মজুর আদিবাসীদের থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিবাহে রোটি বেটি সম্পর্ক ও পূজা পার্বনে দরি বিরাদরি সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা তাদের মধ্যেএক সামাজিক গোষ্ঠী হওয়া সত্তেও বিভেদ সূচিত করেছে। বৃহত্তর, গুত্বপূর্ণ সমাজ রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের ভাবনা ও প্রতিত্রিয়া গুলি অনেক সময় জোট বাঁধতে পারেনা। রাষ্ট্রিক বিভেদ পন্থার কৌশল গুলিতে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এই রাজনৈতিক ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার সুবাদে। অধ্যাপক নীরেন চৌধুরীর রচনা থেকে আমরা জানছি, দেখা গেছে ১৮৯১ খ্রীঃ থেকে ১৯১১ খ্রীঃর মধ্যে ২৫ লক্ষেরও অধিক জনজাতি নিজেদের আবাসস্থল পরিত্যাগ করে অন্য প্রদেশে চলে গেছে। একসময় ছোটনাগপ সাঁওতাল পরগণার অধিবাসী সম্পূর্ণরূপেজনজাতির ছিল। কিন্তু বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ও বহু সংখ্যক জনজাতির নিষ্মণের ফলে জনজাতির অনুপাত দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৭১ খ্রীঃর আদম শুমার এ দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি জেলাতেই (একমাত্র রাঁচী জেলা বাদে) জনজাতি জনসংখ্যার অনুপাত মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের ও কম। তথ্যটী আদিবাসীদের অস্তিত্বের সঙ্কটজনক অবস্থার মূর্তিমান দলিল। নিজভূমি ও ঊর্বর কৃষিসম্পদ, বনজ সম্পদ ও খনিজ সম্পদের এলাকা থেকে সভ্যতার পিলসুজ ভূমিপুত্রদের উৎখাত করার উদ্দেশ্যই সমগ্র প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বলাৎকারের প্রয়োজনে শাসক শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করা। একই সময়ে সভ্যতার স্তম্ভ স্বরূপ মানুষগুলিকে ভূপতিত করে ঐতিহ্যের স্মারক সংস্কারগুলিকে ভারতবর্ষের গ্রামীন মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা। হরপ্পা সভ্যতার নির্মূল ধবংস এই ভাবেই সভ্যতাদর্পীর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। একই ভূখণ্ডে আদিবাসী জনতার এই ত্রমহ্রাসমান সংখ্যা সমাজে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। অধ্যাপক চৌধুরী এই সমস্যার উপর যে আলোকপাত করেছেন তা অত্যন্ত প্রাণিধান যোগ্য, (তাঁরা) যেখানেই গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পরিবারের গোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছেন, অল্প সংখ্যা হেতু তাদের উচ্ছেদ করাও সহজ হয়েছে এবং এদের প্রায় যাযাবরের মতো জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়েছে। বর্তমানের ঝাড়খণ্ড সংখ্যা বেশী তাঁরাই এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। সংখ্যা, স্থান ও উদ্দেশ্য এই তিনটি কারণই পরিযায়ী জনজাতির গন্তব্যস্থলে স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সংস্কৃতি প্রভাবের স্বরূপ জানতে সাহায্য করে।

মাইরন ভেইনার তাঁর 'ত্রঙ্করুব্দ ঙ্গন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ব্দঙ্গনপ্তু' ছ১৯৭৮গ্ন বইতে উল্লেখ করেছেন, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আনুমানিক ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার জনজাতি ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা থেকে অন্যত্র পরিগমন করেন। নিষ্মণের গতি ত্রমে ত্রমে আরও দ্রুত হয়ে এবং লেখকের মতে, ১৯২১ খ্রীঃ নাগাদ ওই দুই অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ জনজাতি তাদের পিতৃভূমি পরিত্যাগ করে। মনে রাখা প্রয়োজন, ইংরাজ ও তাদের সহযোগী দেশীয় সামন্ত শোষকদের বর্বরোচিত অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলেই এমন অভাবিত মাত্রায় আদিবাসীদের অভিপ্রস্থান ঘটে। কর্মচ্যুত, বাস্তুচ্যুত, ভূমিচ্যুত আদিবাসীরা বস্তুত সর্বহারায় পরিণত হয়। ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার সংখ্যাটী সরকারী তথ্য এবং সে সময়ের জন সংখ্যার হিসাবে অত্যন্ত উদ্বেগজনক সন্দেহ নেই। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও আদিবাসী মানুষ ইংরাজ প্রদর্শিত এই লালসার নাগপাশ থেকে মুত্ত হয়নি। ১৮৩৫ সাল থেকে অভিপ্রস্থানের এই বিষয়টা যথেষ্ট সঙ্কটজনক অবস্থার দিকে এগিয়ে যায় মূলত এই কারণ গুলির জন্য--ক) ১৯৩৫ সাল থেকে দেশীয় জমিদারদের আয়ত্তাধীন জমিদারী ও তহশীল এ ব্যাপক হারে নীলচাষ শু হয়। কৃষক ভূমিপুত্রদের ইংরাজ সৈন্য ও দেশীয় লঠিয়াল, গুণ্ডা, পাইক পেয়াদাদের সাহায্যে ঊর্বর ধানী জমিতে অথবা গম, ভুট্টা, জোয়ারের ক্ষেতে ফসলের চাষ না করে নীল চাষে বাধ্য করা হয় অধিক মুনাফা লাভের জন্য ও ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্প সহযোগী রঞ্জন শিল্প গুলিকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। সাঁওতালরাই মূলত নীল চাষে সস্তা মজুরী শ্রমে নিযুত্ত হত শারীরিক উৎপীড়ন ও অন্যান্য ভয়ের কারণে। অপুষ্টি অনাহারে ভুগে অনেকেই মারা যায় এবং বেশীর

ভাগ মানুষ মাতৃভূমি পরিত্যাগে বাধ্য হয়।
(খ) পূর্বরেলওয়ের লুপ লাইন--- রেলের লাইন পাতার জন্য শক্তিশালী সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ প্রভৃতি আদিবাসী পুষ ও রমনীদের ইংরাজ ও তার সহযোগী বাহিনী কুলী - কামিন হিশেবে নিয়োগ করে। নীলকর সাহেবদেরর খপ্পর থেকে পালিয়ে তারা তখন নিরন্ন অবস্থায়, অন্ন সংস্থানের জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছিল। চরম দারিদ্র্যের দন শোষক বা হিনী আদিবাসীদের গৃহছাড়া করার সুযোগ পায়।
(গ) চা - বাগিচা শিল্পের বিকাশ -- ইংরাজেরা ১৮৩৯ খৃঃ এ প্রথম আসামে এবং ১৮৭৪ খৃঃ এ উত্তরবঙ্গে চা - বাগান তৈরী করে। ১৮৭৪ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে এই শিল্পের ব্যাপক বিকাশ আদিবাসী পুষ রমনীদের নোতুন জীবনের সন্ধানে ভূমিত্যাগে বাধ্য করে। এই সময় থেকেই আদিবাসী গ্রামীন বসতি গুলির অবশিষ্ট অংশে কুখ্যাত আড়কাঠিদের উৎপাত শু হয়। আজও গ্রাম বাংলার সর্বত্র বর্গী হাঙ্গামাকারীদের মতো আড়কাঠিদের নিয়ে গল্প চালু আছে, নানা কথকতা ও লোককাহিনীর মধ্যে। আড়কাঠিরা ইংরাজের উচ্ছিষ্ট ভোগী দোসর রূপে আদিবাসী জীবনে বহু দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।
(ঘ) গ্রামান্তরে স্থানান্তর --- ইংরাজেরা আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে দালাল ইজারাদারদের হাতে ছেড়েড় দেওয় ায় আদিবাসীদের জীবনে আরেক প্রস্থ দুর্গতি নেমে আসে। সে দুর্গতি অবর্ণনীয়। বাংলা - বিহার - উড়িষ্যার কৃষককুলকে ধবংস করার জন্য ইংরাজরা শস্যক্ষেত্রগুলিতে পঙ্গপালের মতো নেমে এসেছিল। ফলে নিজস্ব গ্রামগুলি ছেড়ে তারা অন্য গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হয়। আদিবাসী অভিপ্রস্থানে পশ্চিমবঙ্গে দুটী ধারা ছিল বলেমনে হয়। একটী উত্তরের ধারা। এই পথে আদিবাসীরা ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণা থেকে মুর্সিদাবাদের রাজমহল পাহাড় হয়ে গঙ্গ া পেরিয়ে মালদা হয়ে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধারাটাই আরও আগুয়ান হয়ে আসাম ও ত্রিপুর াতে প্রবেশ করে মূলত চা বাগিচা ও রেলপথ নির্মাণের শ্রমিক রূপে। আরেকটী ধারা দক্ষিণের ধারা এই ধারায় আদিব াসীরা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুলিয়া থেকে বর্ধমান, বীরভূম, হুগলী ও হাওড়া জেলায় ঢুকেপড়ে এবং সমুদ্রমোহানায় হলদীয়া হয়ে দক্ষিণ চবিবশ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চল গুলিতে গ্রামীন বসতি স্থাপন করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে উত্তর চবিবশ পরগণাতেও স্থানান্তরিত হয়।

আদিবাসীদের অভিপ্রস্থানের বিষয়ে গবেষণা ও মৌলিক চিত্রটি একান্ত ভাবে উঠে আসা প্রয়োজন, নতুবা বর্তমান রা ষ্ট্রিক রাজনৈতিক মানচিত্রের সীমানা তাদের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতায় আরও বেশী মদত দেবে। যা কিনা রাষ্ট্র সঙঘ ঘো ষিত মানবাধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ও পন্থার বিপরীতে কাজ করবে। দলিত কৌমের আত্মসার (Life essence) নিষ্পেষিত হবে সংখ্যাগু জাতি ধর্মের মাতববরীতে।